কালের কণ্ঠ

ঢাকা, শনিবার ২০ জুন ২০১৫, ৬ আষাঢ় ১৪২২, ২ রমজান ১৪৩৬

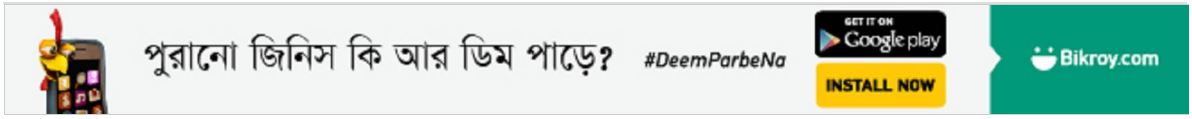

সিরাজী নিশানা

শেয়ার - মন্তব্য (0) - প্রিন্ট

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর নামনিশানা মুছে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি মীর জাফর আর ব্রিটিশ বেনিয়ার দল। নিকটজনরা হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সেদিন সিরাজ পরিবারের নবম পুরুষ তরুণ গোলাম আব্বাস জানালেন, তাঁর কাছে কিছু নিদর্শন আছে। ২৩ জুন সামনে রেখে সেগুলো দেখতে গিয়েছিলেন চন্দন চৌধুরী। ছবি তুলেছেন নাভিদ ইশতিয়াক তরু

অ অ- অ+

তরুণের আংটিটি দেখতে বেশ। যদিও পুরনো ধাঁচের। মধ্যখানে লাল পাথর, এর মধ্যে কয়েকটা আরবি হরফ। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, এটা ব্যবহার করতেন সিরাজদ্দৌলার কন্যা উম্মে জহুরার ছেলে শমসের আলী খান। এ কথা শোনার পর নড়েচড়ে বসতেই হয়। জিনিসটা রুপার তৈরি। নবাবের বংশধররা সোনার জিনিস ব্যবহার করেন না। সোনার জিনিস ব্যবহার করলে সেটা ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমন একটা ধারণা আছে তাঁদের মধ্যে। এবার তরুণের দিকে একটু ভালো করে তাকাই। নাম গোলাম আব্বাস। বললেন, তিনি নবাবের নবম পুরুষ। ঘরের দিকে চোখ যেতেই চোখে পড়ল একটা হরিণের শিং। এই শিংও কি আগের?

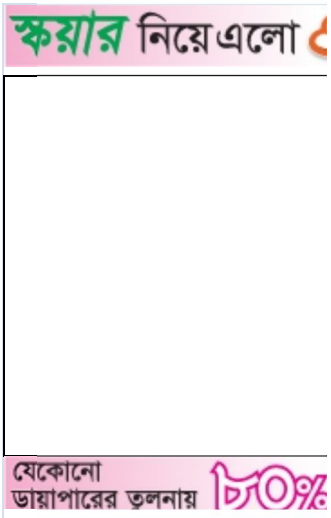

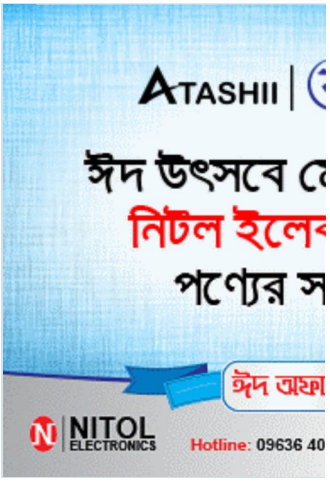

অবসরে - এর আরো

একদিন সা

হামদর্দ

একনজরে

ইতিহাসের হাহাকার

Ads

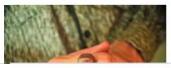

সিরাজ ইস্প

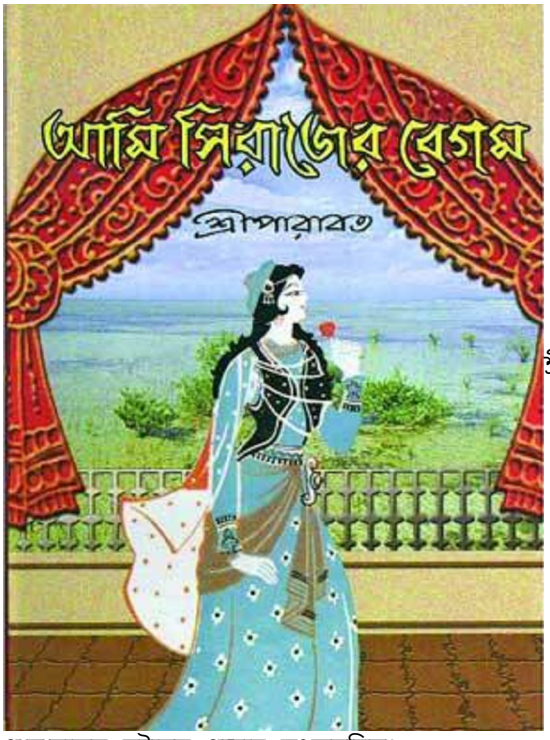

শ্রী

পারাবতের বইয়ের প্রচ্ছদে লুৎফুননিসা

মুর্শিদাবাদে নবাব আর নবাবপত্নী বাস করতেন হীরাঝিল প্রাসাদে। সেখানে তাঁরা অনেক হরিণ পালতেন। শুধু হরিণ নয়, অনেক পশুপাখিও ছিল। এর মধ্যে একটি হরিণ বেশি প্রিয় ছিল। পলাশীর যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর সিরাজ যখন স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান, তখন সব কিছুই ছেড়ে আসতে হয়। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর মীর জাফর, মিরনরা মূলত সিরাজ পরিবারের সব জিনিসপত্র লুট করে নেয়। তবে মানুষের মন লুটে নেওয়া সহজ ছিল না। সেই মুর্শিদাবাদেও রয়ে গিয়েছিলেন সিরাজের অনেক বিশ্বস্ত মানুষ। তাঁরা হয়তো পরিচারকের কাজ করতেন। এমনই একজন নিলুফার। তাঁর কাছে ছিল লুট থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু জিনিসপত্র। সেগুলো লুৎফুননিসার হস্তগত হয়েছিল। এই শিংও নিলুফারের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। নবাবের মৃত্যুর পর ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে বেগম লুৎফুননিসা আট বছর বন্দি ছিলেন। একদিন নিলুফারই এলেন হরিণের শিং আর চামড়া নিয়ে। নবাবের প্রিয় হরিণের বলে কথা! সযত্নে তুলে রাখলেন বেগম লুৎফুননিসা। শিংটি এখনো মজবুত। মনেই হয় না এত সময়ের পুরনো। যত্নে রাখার কারণেই এমনটি হয়েছে। গোলাম আব্বাস বলেন, 'আমাদের দাদা-দাদিদের কাছেও শুনেছি আমাদের অনেক অনুগত ভৃত্য ছিল, যারা আমাদের জন্য জীবন দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল।'

এই পেষণযন্ত্র সিরাজকন্যা উম্মে জহুরা রূপচর্চার কাজে

ব্যবহার করতেন

খুঁজতে লাগলাম হরিণের ছালটি কোথায়? গোলাম আব্বাস এবার দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালেন। মনে হলো, একটা ছবি টানানো। বললেন, এটাই হরিণের ছাল। তাহলে এমন হলো কিভাবে! জানালেন, চামড়াটা তো আসলে সতেরো শ শতকের। কিন্তু আমরা গত শতকের নব্বইয়ের দশকে এটি ইরানে পাঠিয়ে কাজ করিয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষ ইরান থেকে এসেছেন, সেই কারণে আমরা এই চামড়াটির কাজ ইরানে করিয়েছি। সেখানে যে শিল্পী কাজ করেছিলেন তাঁর নাম ফারজাত। হরিণের চামড়ায় রয়েছে দুই নারীর বাদ্য বাজানোর ছবি। চারপাশটায় রয়েছে আলাদা একটা আবরণ। মনে হলো, অনেকটা যেন প্লাস্টিকে বাঁধাই করা।

এবার গোলাম আব্বাস একটা পাথর খুলে দেখান। এটা একটা লকেট, মাঝখানে সবুজ রঙের পাথর। এর মধ্যেও আরবি হরফে কিছু লেখা। তবে এটা এখন ব্যবহার করেন না। জানতে চাইলাম, কোথা থেকে পাওয়া? জানালেন, তাঁর হাতের আংটি আর এই পাথর-দুটিই নবাব সিরাজদ্দৌলার সংগ্রহ। সেই সময়ের বা তারও আগের। সিরাজদ্দৌলা মৃত্যুর আগে লুৎফুননিসাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সূত্রে পাথরগুলো পান তাঁর কন্যা উম্মে জহুরা। উম্মে জহুরার বিয়ে হয় সিরাজের ভাই একরামদ্দৌলার পুত্র মুরাদদ্দৌলার সঙ্গে। তাঁদের এক ছেলে। নাম

শমসের আলী। তিনিই লকেট আর আংটি দুটি ব্যবহার করতেন। এরপর আমার চোখ গেল একটা ছোট্ট পাত্রের দিকে। অনেকটা শ্বেতপাথরের পাত্রের মতো। এটা দিয়ে হয়তো কোনো কিছু পেষা হতো। গোলাম আব্বাস জানান, এটি সিরাজকন্যা উম্মে জহুরার রূপচর্চার জিনিস। কোনো কিছু নিয়ে ঘষে মুখে বা শরীরে লেপন করা যায়, এমন একটা যন্ত্র। পেষণযন্ত্র বলা যায়। পাথরের তৈরি, খোদাই করা। মাঝখানে কোনো কিছু রেখে পেষা যায়। সাধারণত মেয়েরা আগে কোনো কিছু পিষে রূপচর্চার কাজ চালাত। এর সঙ্গে ছোট্ট যে পাথরটা, ওটা দিয়ে সাধারণত পেষা হয়। এমন আরো কয়েকটা জিনিস পাওয়া গেল। তবে বিশেষ করে কোনটি তাঁদের কোন প্রজন্ম ব্যবহার করেছে সঠিক করে বলতে পারলেন না।

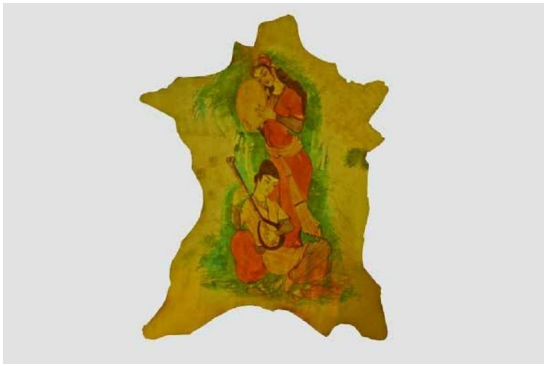

নবাব সিরাজের প্রিয় হরিণের চামড়া। পরে এটি ইরান থেকে কারুকাজ করিয়ে আনা হয়

তবে তামার বাটিটি আবার সিরাজপত্নীর কথা মনে করিয়ে দিল। ঢাকায় জিঞ্জিরা প্রাসাদে তিনি আট বছর বন্দি ছিলেন। তখন তিনি এই পেয়ালায় পানি খেতেন। দেখতে মাটির পেয়ালার মতো, হাতে ধরে বোঝা গেল বেশ ভারী। এটা তামা বা কাঁসার তৈরি। ভেতর-বাইরে দুদিকেই অলংকরণ। উম্মে জহুরার সূত্রেই এই জিনিস তাঁরা বংশপরম্পরায় পেয়েছেন। হয়তো কেউ কেউ ব্যবহারও করেছেন। সঠিক বলতে পারলেন না গোলাম আব্বাস। এরপর তিনি থলে থেকে একটা মোহর বের করে দেখালেন। এটাতেও আরবি হরফ অঙ্কিত। তবে তিনি বললেন, এগুলো নাকি ইংরেজরা বেগম লুৎফুননিসাকে দিয়েছিলেন। এটি দিয়ে তিনি ভাতা তুলতেন। আব্বাস জানান, 'এটা আমরা আমাদের পঞ্চম বংশধর হাসমত আরা বেগমের কাছ থেকে পেয়েছি।' ইংরেজরা মূলত সিরাজের পরিবারের জন্য বিশেষ ভাতা বরাদ্দ করেছিল। আর মোহর দিয়েই ভাতা তোলা হতো। তবে এই মোহর এ জন্য বিশেষ যে এটি লুৎফুননিসার। লুৎফুননিসা মারা যাওয়ার পর ইংরেজরা ওই মোহর নিয়ে যায়। গোলাম আব্বাস জানান, সেই মোহর পরে ফিরে পাওয়া গেছে।

এই মোহর ইংরেজরা সিরাজের স্ত্রী লুৎফুননিসাকে দিয়েছিল। এটি দিয়ে তিনি ভাতা তুলতেন

১৭৭৩ সালের ১৬ জুন। সে সময়ের গভর্নমেন্টের ৫৯৫ নম্বর আদেশে মুরাদদ্দৌলা ও তাঁর পরিবারের জন্য মাসিক ৪০০ টাকা ও সিরাজের স্ত্রী লুৎফুননিসা বেগমের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা বরাদ্দ হয়। কিন্তু স্বাক্ষর নিলেও বরাদ্দ ভাতার সবটুকু দেওয়া হতো না। ১৭৮৬ সালে লুৎফুননিসা মারা যান। তখন তাঁর ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার ভাতা চালু হয়। তবে ছেলেমেয়েদের জন্য ভাতা ক্রমেই ভাগ হতে থাকে এবং কমতে থাকে। মুরাদদ্দৌলার বেঁচে থাকতেই মারা যান উম্মে জোহরা। তাঁদের পুত্র শমসের আলী খানও ভাতার কিছু অংশ পান। শমসের আলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাপ্য ভাতা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করা হয় পুত্র লুৎফে আলী ৭০ টাকা, দ্বিতীয় পুত্র জয়নাল আবেদীন ও পালকপুত্র ৬০ টাকা, স্ত্রী ৩৬ টাকা, নিকট আত্মীয় ১৬ টাকা। মোট ১৮২ টাকা।

সৈয়দ লুৎফে আলী ১৮৩৩ সালে মারা যান। রেখে যান একমাত্র মেয়ে ফাতেমা বেগমকে। তিনিও ভাতা পেতেন। ফাতেমা বেগমের দুই মেয়ে হাসমত আরা বেগম ও লুৎফুননিসা বেগম। গোলাম আব্বাসের দেখানো মোহরটি এই হাসমত আরার কাছ থেকেই পাওয়া। ইংরেজরা সম্ভবত তাঁর কাছেই লুৎফুননিসা বেগমের মোহরটি ফিরিয়ে দেয়। ফাতেমা বেগম ১৮৭০ সালে মারা যান। হাসমত আরা বেগমের বিয়ে হয় চীৎপুর খান্দানের সৈয়দ আলী রেজার সঙ্গে। তাঁদের এক পুত্র সৈয়দ জাকি রেজা। তিনিও মাসিক সামান্য ১৫ টাকা ভাতা পেতেন। ইংরেজ সরকার দয়াপরবশ হয়ে সিরাজদ্দৌলার এই ষষ্ঠ বংশধরকে মুর্শিদাবাদের সাবরেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেন। পরে ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার হন। নবাব পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার কথা ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর কানে

আসে। তিনি সে সময়ের বাংলার গভর্নরের কাছে সৈয়দ জাকি রেজাকে ভালো চাকরি দেওয়ার জন্য সুপারিশও করেছিলেন। জাকি রেজা মারা যান মুর্শিদাবাদে ১৯৩৪ সালে। সৈয়দ জাকি রেজার পুত্র গোলাম মোর্তজা, সৈয়দ বাবু, কন্যা ছিলেন সৈয়দা কানজো ও চাঁদ বেগম। সবাই ছোটখাটো চাকরি ও ব্যবসা করতেন মুর্শিদাবাদে।

সিরাজদ্দৌলার বংশধরদের ব্যবহার করা পানদানি

জাকি রেজার পুত্র গোলাম মোর্তজা মুর্শিদাবাদে কালেক্টরেটে চাকরি করতেন। দেশ ভাগের পর রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার অফিসে চাকরিতে নিযুক্ত হন। এরপর অবসর নিয়ে খুলনায়। গোলাম মোর্তজার পুত্র গোলাম মোস্তাফা ও গোলাম মুজতবা ও মেয়ে বেবি হামিদা বানু। গোলাম মোস্তাফা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা ও সৈয়দা হোসনে আরা বেগমের পুত্র সিরাজদ্দৌলা পরিবারের নবম বংশধর এই সৈয়দ গোলাম আব্বাস আরেব। সৈয়দা হোসনে আরাও নাকি অন্যদিক থেকে সিরাজের স্ত্রী লুৎফুননিসার অষ্টম রক্তধারা।

541 Google + 0 0 0 541

মন্তব্য

comments (0)